সংস্কৃতির ক্ষয়ক্ষতি

অশোকেন্দু সেনগুপ্ত

এক দরজাওয়ালা মিনিবাসের কন্ডাক্টার হেঁকে বলে পেছনের দিকে এগিয়ে যান। পশ্চিমবঙ্গ সম্পর্কে এ এক পুরোনো ঠাট্টা। পুরোনো হলেও সে ব্যঙ্গ পিছু ছাড়ে না। অন্তত গত তিন দশক ক্রমান্বয়ে আমরা পিছনে হাঁটছি যে তা সকলেই মানবে। একেবারে অন্ধ যাঁরা তাঁরা অপেক্ষিকতার তত্ত্ব সামনে ফেলে অনেকবার অনেক সময় তর্ক করেছেন। বলেছেন এই এই বিষয়ে ঐ ঐ রাজ্যের তুলনায় আমরা এগিয়ে গিয়েছি, আর ঐ ঐ ক্ষেত্রে ঐ ঐ পক্ষের বাধাদানের কারণে আমরা তেমন এগোতে পারিনি। এখন সেই সব মানুষগুলোও আড়ালে চলে যাচ্ছেন। শাক দিয়ে আর মাছ ঢেকে রাখা যাচ্ছে না, এখন মিনিবাসের পাশ দিয়ে এগিয়ে চলেছে পদাতিকরাও। মানতেই হবে যে, আমরা পিছিয়ে পড়েছি, পিছিয়ে পড়ছি, না মানলে আরও পিছিয়ে পড়ব।

তবে, মেনে নিলে তরতরিয়ে এগিয়ে যাব এমন নয়। এগোতে হলে কয়েকটি সাধারণ সত্য মেনে নিতে হবে। কয়েকটি সঙ্কল্প করতে হবে।

সত্য এই যে আমরা গত কয়েক দশকে আত্মবিশ্বাস অনেকটা হারিয়ে ফেলেছি। এভাবে হবে না, ওভাবে হবে না, হয়নি - হবে না— এই জালে পড়ে গেছি। আত্মবিশ্বাস না থাকলে কোনও প্রাপ্তবয়স্ক হাঁটতে পারে না। এর মধ্যে কারও কারও কিছু হয়েছে বটে কিন্তু তা সত্য সঙ্কল্পের জোরে নয়, অন্য কিছুর জোরে।

সঙ্কল্প এক: আমরা এগোব। আর ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই নিশ্চয়।

সঙ্গল্প দুই : নিজের সঙ্গে প্রবঞ্চনা না করে কোন ক্ষেত্রে কতখানি এবং কেন পিছিয়ে পড়েছি তা নির্ভেজাল তথ্য ও যুক্তি দিয়ে বিবেচনা করব। এই সঙ্কল্পের অনেকখানি ব্যাখ্যার প্রয়োজন আছে। এই প্রবন্দের মূল আলোচ্য বিষয়ও তাই।

এই সঙ্কল্প ব্যাখ্যায় অনেক কুয়াশা - ধোঁয়াশা-ভ্রান্তি পার হতে হবে। বহু মানুষ বিশ্বাস করেন যে, এই রাজ্য প্রায় সব ক্ষেত্রেই দেশের অন্য বহু রাজ্যের তুলনায় অনেকটা পিছিয়ে পড়েছে। এখনও বহু মানুষ আছেন যাঁরা তা বিশ্বাস করেন না। যাঁরা বিশ্বাস করেন না বা যাঁরা বিশ্বাস করেন তাঁদের কারও মুখ পানে আমাদের তাকানোর প্রয়োজন হয় না যদি আমরা তথ্যে ভরসা রাখি। মুশকিল হয়েছে এই যে এই রাজ্যের সরকারি তথ্যেও বেজায় ভেজাল। তবু, সরকারি তথ্যে ভরসা রেখে আর চোখকান খোলা রেখেও বেশ কিছুটা পথ হাঁটা যায়। তাই করব।

ক্ষেত্র অনেক। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, যোগাযোগ, কৃষি, শিল্প ইত্যাদি। আলোচনা সংক্ষেপ করার জন্য কয়েকটি মাত্র উদাহরণ দেব।

১৯৭৭ সালে প্রাথমিক শিক্ষায়, কেবল সাক্ষরতার বিচারে, দেশের আমাদের স্থান ছিল চতুর্থ। এখন আমাদের স্থান দেশের প্রধান রাজ্যগুলির মধ্যে অষ্টাদশতম (জনগণনা, ২০০১)। গুণগত মানও প্রশংসনীয় নয়। শিক্ষা উন্নয়ন সূচকে দেশের মোট ৩৫টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মধ্যে আমাদের অবস্থান ৩৪তম (২০০৪-০৫)। স্বাস্থ্যের হাল যে করুণ তা বোঝার জন্য অনেক তথ্যই দেওয়া যায়। তার প্রয়োজন নেই, প্রতিটি মানুষের অভিজ্ঞতা একই রকম। সরকারি হাসপাতালের চরম অব্যবস্থা, বেসরকারি হাসপাতালের 'দিনে-দুপুরে ডাকাতির' অনেক মর্মন্তুদ কাহিনি আমাদের সকলের জানা। ভিন্ন রাজ্যের স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে এই রাজ্যের মানুষের ভিড় আমাদের চিকিৎসাব্যবস্থার প্রতি চরম অনাস্থার নির্ভেজাল প্রমাণ। প্রথমে 'সবুজ বিপ্লব' আর পরে ভূমিসংস্কারের কল্যাণে কৃষিতে আমরা গত শতাব্দীর আটের দশক পর্যন্ত বেশ তরতরিয়ে এগিয়েছি, তারপর কেবল পিছু হঠা। বিপুল সংখ্যক মানুষের বাস দারিদ্রসীমার নীচে, এবং এই রাজ্যের প্রগতিশীল সরকারের রাজত্বে বহু মানুষ মারা যান অপুষ্টি ও অনাহারে। কৃষিতে কেরামতি দেখাতে আমরা সরকারের প্রত্যক্ষ মদতে মাটির তলা থেকে যথেচ্ছ জল তুলে নিয়েছি, যথেচ্ছ কীটনাশক ব্যবহার করেছি। এখন রাজ্যের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ ব্লকে ভয়াবহ আর্সেনিক ও ফ্লুওরাইড দূষণ।

সবচেয়ে খারাপ অবস্থা বোধকরি সংস্কৃতি ক্ষেত্রে। গোড়াতেই বুঝে নিতে হবে কার সংস্কৃতি, কোন সংস্কৃতি? এই ক্ষেত্রে ব্যক্তি গৌণ, ব্যক্তি চর্চিত সংস্কৃতি থাক আমাদের বিবেচনার বাইরে। আমাদের বিবেচ্য গোষ্ঠী-সমাজ-জাতি। সংস্কৃতির ভালো-মন্দে প্রধান ভূমিকা পরিবেশ (প্রাকৃতিক, পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক) ও শিক্ষার। সংস্কৃতি ক্ষেত্রের সঙ্গে অন্য ক্ষেত্রগুলির মৌলিক পার্থক্যটিও মাথায় রাখা প্রয়োজন। এই আলোচনা হবে প্রধানত নাগরিক জীবনের দিকে চোখ রেখে।

যোগাযোগ, কৃষি, বিদ্যুৎ ইত্যাদি ক্ষেত্রে দ্রুত (পাঁচ-দশ-পনের বছর) পরিবর্তন (ভালো বা মন্দ, পতন বা উত্তরণ) ঘটানো সম্ভব। শিক্ষাক্ষেত্রে তেমন দ্রুত পরিবর্তন ঘটানো অসম্ভব বলেই মনে করা হতো অতীতে। এই রাজ্যে বামফ্রন্টের রাজত্বকালে দেখা গেল শিক্ষাক্ষেত্রটি জীর্ণ করার প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করার জন্য দশ বছর সময়ই যথেষ্ট। ক্ষমতায় এসে বামফ্রন্ট 'শিক্ষা গণতন্ত্রীকরণের' নামে যে আন্দোলন শরু করে সেই পথেই 'শিক্ষা দলতন্ত্রীকরণের' কাজ দ্রুতলয়ে এগোতে থাকে এবং শিক্ষাকাঠামো ভেঙে পড়ে, শিক্ষাক্ষেত্রে নৈতিকতা - ঐতিহ্য-দায়বদ্ধতা ইত্যাদি শব্দের অর্থই বদলে যায়। ভালো উদ্যোগ একেবারেই কিছু ছিল না এমন নয়, কিন্তু

ভাঁটার সুতীব্র টান নোঙর উপড়ে ফেলে। বোঝা যায় যে, শিক্ষাক্ষেত্রে দ্রুত পতন সম্ভব, কিন্তু দ্রুত উন্নয়নমুখী পরিবর্তন যে সম্ভব এমন প্রমাণ মেলে না।

এবার তাকাই সংস্কৃতি ক্ষেত্রটির দিকে। একজন মানুষের অনেকগুলি পরিচয় একই সঙ্গে থাকা সম্ভব। ধরা যাক একজন শিক্ষক। তিনি একটি পরিবারের সদস্য, একটি সমাজের অংশ, একটি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত, তিনি একটি শিক্ষাব্যবস্থার ফসল ইত্যাদি। কোনও একটি পরিচয় বিবেচনা করলে তাঁর সংস্কৃতির পূর্ণ পরিচয় পাওয়া সম্ভব নয়। আমরা আশা করে থাকি যে, একজন শিক্ষক হবেন সৎ নিষ্ঠাবান, চরিত্রবান ইত্যাদি। সেই মানুষটি একটি ঘোরতর অপরাধ প্রত্যক্ষ করেও, সমাজবিরোধীদের ভয়ে, নিজের পরিবারের নিরাপত্তার কথা বিবেচনা করে যদি প্রতিবাদে মুখর হতে ভয় পান, অথবা পরীক্ষার হলে গণ-টোকাটুকি দেখেও তিনি প্রতিরোধের চেষ্টা যদি না করেন তখন তাঁকে কি বলব অসৎ বা অযোগ্য? বলতেই পারি, কিন্তু তা বলার আগে একবার কি ভাবব না যে সমাজ তাঁকে নির্বিঘ্নে কাজ করার পরিবেশ দিতে পারেনি। গণ-টোকাটুকির কথাই ধরা যাক। এই মারাত্মক অপরাধ গত শতকের ছয় -সাত দশকে আমাদের শিক্ষাপ্রাঙ্গণ কলঙ্কিত করেছিল। একই সঙ্গে একথাও সত্য যে শিক্ষকসমাজ এই অপরাধের প্রতিবাদ করেছিলেন বলেই সে কথা সমাজ জানতে পারে। সাতের দশকের শেষে শিক্ষকসমাজ ও সংশ্লিষ্ট সব পক্ষের আন্তরিক চেষ্টায় গণ-টোকাটুকি যুগের অবসান হয়। কিন্তু, বছর দশেক পরে চুপিচুপি শিক্ষাপ্রাঙ্গণে ধীরপায়ে এই ব্যাধি ফিরে আসে। ফিরে আসে পরীক্ষাব্যবস্থার দুর্বলতা ও প্রশাসনের প্রচ্ছন্ন প্রশ্রয়ের সুযোগ। তাই আর প্রতিরোধ তীব্র হয় না, প্রতিবাদী শিক্ষকের পাশে দাঁড়ায় না শিক্ষকসমাজ, ছাত্রসমাজ বা প্রশাসন। সমাজ তখন মিশে গেছে সংগঠনে এবং এক সংগঠনের অপরাধ আড়াল করতে এগিয়ে আসে আরেক সংগঠন বিচিত্র এক ভ্রাতৃত্বের বিকৃত আদর্শের তাড়ায়। এই বিকৃত আদর্শ আমাদের সংস্কৃতির পিঠে চাপে।

তাকানো যাক প্রশাসনের দিকে। একথা সত্য যে, স্বাধীনতার পরই দেশের প্রশাসন দ্রুত তার নিরপেক্ষতা হারাতে থাকে। গত তিন দশকে এই রাজ্যের প্রশাসন প্রকাশ্যে শাসকদলের পক্ষ অবলম্বন করাই ধর্মজ্ঞান মনে করে চলেছে। শাসকদলের সন্ত্রাস তাদের চোখে পড়ে না, শাসকদলের অন্যায় ঢাকা দিতে দেশের আইন উপেক্ষা করতে তাদের সঙ্কোচ হয় না। সমাজও এই বিচ্যুতিকে রীতি বলে মেনে নিতে শিখেছে। কেউ যদি ঘুষ না নেন তবে আমরা উচ্ছ্বসিত হয়ে তাঁর প্রশংসা করি, ভুলে যাই যে ঘুষ না নিয়ে কাজ করাটা তাঁর চাকরির শর্ত। অনিয়ম-অন্যায়ের জন্য বেশ কিছুটা জায়গা ছেড়ে রাখা আমাদের সংস্কৃতিতে এবং সংস্কৃতি থেকে অভ্যাসে মিশে গেছে।

মরিচঝাঁপি! মরিচঝাঁপিতে রাজ্য পুলিশ যে নৃশংসতা ও মানবিক অধিকারদলনে যে তৎপরতা দেখিয়েছে তাতে সে গেস্টাপো বাহিনির খুব কাছে বসার যোগ্য বলে বিবেচিত হতে পারে ইতিহাসে। কেবল রাজ্য পুলিশকে দোষ দেব? কোনও প্রগতিশীল সরকারের নির্দেশে, শিক্ষিত প্রশাসনের প্রত্যক্ষ তদারকিতে কোনও দেশে এমন বর্বরতা অভাবনীয়, অবিশ্বাস্য। নির্বাচনে পরাভূত হতমান বিরোধীপক্ষ ছুটে যায়নি, বামশরিকরা ক্ষীরের ভাগ পেয়ে উৎসবে মেতেছে, দুয়ারে খিল তুলে ঘুমিয়েছে সংবাদমাধ্যম, সংশয়াকুল ছিল বিচারব্যবস্থা। তাই আমরা কিছু দেখিনি, কিছু শুনিনি। আমাদের এই উদাসীনতার সুযোগে দুর্গম মরিচঝাঁপি থেকে বালিগঞ্জের বিজনসেতু, এসপ্ল্যানেডের রাস্তায়, সিঙ্গুরে, নন্দীগ্রামে 'আন্ধার নামে'। কেন উদাসীনতা, কেন মুখ ঘুরিয়ে থাকা, কেন প্রভুদের আজ্ঞাবহ হয়ে থাকা?

বাঙালি স্বভাবত বামপন্থী এমন কথা অনেক শুনেছি। স্বাধীনতার আগে পরে বাংলার রাজনৈতিক ও সামাজিক আন্দোলনের ধারা পর্যালোচনা করলে, বাংলার নাগরিক সমাজ যে সংস্কৃতি অনুশীলন করেছে তা বিবেচনা করলে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, বাংলার নাগরিক সমাজ স্বভাবত বামপন্থী না হলেও অন্তত তার প্রতিবাদ-প্রতিরোধের ধারা ছিল বামমার্গী। তথাকথিত দক্ষিণপন্থী জাতিয়তাবাদীরাও মানবতার অবমানে ব্যথিত হয়ে, মানুষের লাঞ্ছনায় ক্ষুব্ধ হয়ে বারেবারে প্রতিবাদে মুখর হয়েছেন নির্দ্বিধায়। মানুষ চালিত হয়েছে হৃদয়ের নির্দেশে। সেই সংস্কৃতি ভেঙেচুরে বিকৃত করার প্রক্রিয়া শুরু হয় বামপন্থী রাজনৈতিক দলগুলির প্রত্যক্ষ মদতে প্রথম যুক্তফ্রন্টের সময় থেকে। এই পরিবর্তন গৌরকিশোর ঘোষ-সমরেশ বসু-সুভাষ মুখোপাধ্যায়দের মতো সাহিত্যিকদের নজর এড়ায়নি, কিন্তু নবধারার সাহিত্যসেবীদের জলমেশানো সমাজবিযুক্ত সাহিত্য যে প্রবল কোলাহলে গৌড়প্রাঙ্গণ মাতিয়ে তোলে তাতে গৌরকিশোর ঘোষেদের গুরুত্ব হারায়। নবধারার সাহিত্যসেবীদের একহাতে ছিল প্রতিষ্ঠানের প্রসাদ, অন্যহাতে ছিল প্রগতির ধ্বজা। নয়া রোমান্টিসিজমের ঝোড়ো হাওয়ায় সাহিত্যপ্রাঙ্গণ থেকে খড়কুটোর মতো উড়ে যায় প্রতিবাদ-প্রতিরোধের কাঠামো। আমরা প্লাবনের সঙ্গী হয়ে আসা হাওয়ার উচ্ছ্বাস দেখে উল্লাসে মেতেছি, দেখিনি সংস্কৃতির বাঁধভাঙা জলের তাণ্ডব। এই তাণ্ডবে কোথাও শিকড়ে পড়েছে টান, কোথাও তারে তার জড়িয়ে গেছে। তার চেয়েও বড় যে পরিবর্তন এল তা হল অতি বিপ্লবী বাম থকে সীমিত ক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে দল ও ব্যক্তির আখের গোছানো বাম হয়ে ওঠা। আর হৃদয়ের নির্দেশ নয়, এল সঙ্ঘের নির্দেশ শোনার কাল, মানুষের মুখ নয়, এল মিছিলের বার্তা থেকে আর পতাকার মুখ দেকে কর্তব্য নির্ণয়ের দিন। তাই তো মরিঝাঁপির বর্বরতা দেখতে পাইনি, তার আর্ত কণ্ঠ শুনতে পাইনি।

আরও অল্প দু-চার কথা বলা প্রয়োজন বোধ করছি। নাগরিক সমাজ সংস্কৃতি বলতে প্রধানত শিল্পকলা, সাহিত্য, গান, নাটক এসবই বোঝে। রবীন্দ্র-উত্তর পর্বে এই সব ক্ষেত্রে অনেক প্রতিভাবান মানুষ এসেছেন যাঁরা

বঙ্গসংস্কৃতিকে ঋদ্ধ করেছেন। কেউ কেউ কিছু পুরস্কার, কিছু রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতা, কখনও কোথাও কিছু সম্বর্ধনা নিশ্চয় পেয়েছেন। কিন্তু কে পেল এবং কেন পেল তা নিয়ে তুমুল আলোচনা হত। প্রায় সকলে অত্যন্ত সচেতনভাবে স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতারক্ষা করে গেছেন, মস্তকবিক্রয় ছিল সামাজিক লজ্জা। যখন সতীকান্ত গুহ সাহিত্য পুরস্কার পেলেন তখন প্রাপকের চেয়েও নির্বাচকরা নিন্দিত হলেন বেশি।

গত তিরিশ - পয়ত্রিরিশ বছরে আদর্শ বা অঙ্গীকার রয়েছে একই রকম, কিন্তু রীতিনীতি আর সমাজের খাঁচাটা এতটাই বদলে গেছে যে স্বাধীনতা বা স্বাতন্ত্র্য নিয়ে শিল্পীরা আর মাথা ঘামান না বা ঘামানোর সুযোগ পান না। একথার সামান্য ব্যাখ্যার নিশ্চয় প্রয়োজন আছে। এখন কে পুরস্কার পাচ্ছেন কেন পাচ্ছেন তা নিয়ে তেমন আলোচনা হয় না। যার প্রভাব বিস্তার করার ক্ষমতা যত বেশি আসরে তার মর্যাদা বা গুরুত্ব তত বেশি। তিন ধরনের মানুষের প্রভাব বেশি— এক: সরকারি আধিকারিক, দুই: বড় পত্রিকার গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি, তিন: বড় রাজনৈতিক দলের ঘনিষ্ঠ। বাকিদের অনেকে প্রায় সকলে, প্রভাবশালী মানুষের বৃত্তে থাকার জন্য ঘুরঘুর করে। কেন করে? গত তিরিশ বছরে এই রাজ্যে জনসংখ্যা বৃদ্ধির দশ বা তারও বেশি গুণ হারে বেড়েছে উৎসব, মেলা ইত্যাদি। গানমেলা, নাট্যমেলা, কথসাহিত্য উৎসব, কবিতা উৎসব, হলদিয়া উৎসব, বইমেলা ইত্যাদি। যদি আপনি একজন লেখক হন নিশ্চয় চাইবেন পাঠকের কাছে পৌঁছতে। পৌঁছতে হলে যেসব যোগ্যতা লাগে তার একটি, অনেকের জন্য একমাত্র উপায়, হল মেলা বা উৎসবে মুখ দেখানো। তার জন্য কাউকে ধরতে হবে। মেলা বা উৎসবে ডাক পেলে কিছু টাকাও জুটবে, কিছু নামও হবে। বোর্ড, সংসদ, বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদির কেউকেটা হলে কাউকে ধরার জন্য ব্যস্ত হতে হবে না, প্রকাশকই আপনাকে ধরবে। কবীর সুমন প্রকাশ্যে এমন অভিযোগ করেছেন, কেউ তার প্রতিবাদ করেননি।

এভাবেই চলেছে বাংলার শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি ইত্যাদি, রাষ্ট্রশক্তির পরিকল্পিত পথে এগিয়ে সেসব গেছে ধ্বংসের পথে। সুনিশ্চিত ধ্বংসের পথ থেকে আমাদের ফিরিয়ে এনেছে সিঙ্গুর - নন্দীগ্রাম। ১৪ নভেম্বরের ঐতিহাসিক মিছিলে কলকাতার রাস্তায় মানুষের ঢল নামে কেবল নন্দীগ্রামের শাসক দলের সন্ত্রাসের প্রতিবাদ জানাতে নয়, বহু মানুষ পথে নেমেছে শিকলভাঙার সংকল্প ঘোষণা করতে। সেও এক বিপ্লব। কিন্তু বিপ্লব ভোজসভা নয়, ওয়ান ডে ক্রিকেট উৎসব নয়, যে কোনও বিপ্লব সফল করতে দীর্ঘকাল সংগ্রাম করতে হয়। সে ধৈর্য বা তেমন মনের জোর অনেকের থাকে না, তাই অনেকে ভিন্নপথে চলে যায়। এই রাজ্যের ২০০৯ সালের লোকসভা নির্বাচনের পর পরিবর্তনপন্থীদের অনেকেই ঝিমোচ্ছেন এখন, অনেকে হাতে গরম ফল না পেয়ে হতাশ, অনেকে লোকসভা নির্বাচনের ফল নিশ্চিত জয়ের সঙ্কেত ভেবে তৃপ্ত।

এই রাজ্যের সামাজিক-রাজনৈতিক - সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে সন্ত্রাস ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ-প্রতিরোধ গড়ে তুলতে সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের মানুষ যে আন্দোলন শুরু করেছে এবং সাধারণ মানুষ যে আন্দোলনে যোগ দিয়েছে অন্তরের তাড়নায় ও আবেগে, অভূতপূর্ব স্বতঃস্ফূর্ততায়, যে আন্দোলনের লক্ষ্য কেবল রাজ্যের শাসক বদল এমন ভাবলে আমরা ধীরে ধীরে আবার পুরোনো অবস্থানে, সর্বনাশের কিনারায়, ফিরে যাব, ফিরে যাব শাসকের বিছানো মৃত্যুফাঁদের দিকে।

এবার বলি সঙ্কল্প তিনের কথা। আমাদের পা ফেলতে হবে সার্বিক মঙ্গলের পথে, সকলের মঙ্গলের জন্য। অন্য কারও গাড়ি আমাদের সেই স্বপ্নের রাজ্যে পৌঁছে দেবে না, তা সম্ভব নয়, নয়নের মণি সরকার, মেহনতি মানুষের সরকার, বন্ধু সরকার ভালোবাসায় মাখোমাখো কতশত ডাকে তাকে পাশে চেয়েছি আর সে এসেছে দলের দড়িদড়া-শিকল-মুগুর নিয়ে। আমরা ভুল করেছি সরকারকে পরম হিতৈষী প্রতিষ্ঠান ভেবে, সর্বশক্তিমান ভেবে এবং তার কাছে আত্মসমর্পণ করে। আমাদেরই অসাবধানতায়, উদাসীনতায় সরকার স্বৈরাচারী হতে পেরেছে। সরকারের কিছু শক্তি থাকে, জনগণের হিতসাধনে তার কিছু সহায়ক ভূমিকা থাকা সম্ভব যদি সে থাকে আমাদের সতর্ক প্রহরায়। এতো গেল একটা দিক, এ হল বেড়া দেওয়া। কর্তব্যের রয়েছে আর এক দিক। শিক্ষা-সংস্কৃতির জমিতে এমন নামতে হবে হৃষ্টপুষ্ট বীজবপনে। এই কাজে নাগরিক সমাজের দায়িত্ব সর্বাধিক।